ধারাবাহিক রচনা

আছে পান্থধাম

লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

মিতা মজুমদার

মহারাজের ক্লাসের একটি অনবদ্য দিক ছিল গল্প। দুরূহ তত্ত্বকে গল্পের মাধ্যমে সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। যেমন—সংসার হল বিশালাক্ষীর দ, গোলকধাঁধা—শ্রীরামকৃষ্ণের এই তত্ত্বকথাটি বোঝাতে গিয়ে মহারাজ বলছেন, ''এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বহুদিনের এক ঘটনা। আপনাদের বলি। আমি এক ভদ্রলোককে খুব শ্রদ্ধা করতাম, সম্মান করতাম। অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির মানুষ। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তা আমি সাধু হওয়ার পর তিনিও ধরে বসলেন—'আমিও বেলুড় মঠের সাধু হব।' অনেক ধরে করে মঠকে রাজি করালাম। ঠিক হল উনি যোগ দেবেন। তা মার মত আনতে দেশে গেলেন। বাড়িতে ঢুকে দেখেন সেখানে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। কী ব্যাপার! তাঁর দিদির ছেলে জলে ডুবে মারা গেছে। ওই শোকের সময় মাকে আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি। এদিকে গ্রামের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধরে বসলেন তাঁকে কাশী নিয়ে যেতে হবে। তাঁর শালগ্রাম শিলা কাশীতে দিয়ে আসবেন। ভদ্রলোক ভাবলেন ভালই হল। সাধু হওয়ার আগে কাশী দর্শন। ওখান থেকে মাকে চিঠি দিলেই হবে। এদিকে কাশী যাওয়ার পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধরে বসলেন, 'ভাই, এত কাছে এলাম। চলো একবার বৃন্দাবনটা ঘুরে যাই।' উনি তাই গেলেন। তারপর হল কী, বৃদ্ধ বৃন্দাবনে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেখানকার হসপিটালে তাঁকে ভর্তি করা হল। উনি সুস্থ হলেন কিন্তু খুব দুর্বল। বাধ্য হয়ে ওঁকেই আবার তাঁকে দেশে পৌঁছে দিতে হল। এবার বাড়ি ফিরে দেখেন আর এক ঝামেলা। বাড়ি ভাগ হচ্ছে। বড় ভাই, ছোট ভাই সব ওঁকে সালিস মানছেন। উনি সাধু হবেন শুনে সবাই বললেন, 'সাধু হওয়ার জন্য মঠে যেতে হবে কেন? এখানে জমি দিচ্ছি, আশ্রম করে থাকো।' সবার জোরাজুরিতে ওঁকেও তাই থাকতে হল। আশ্রম বানিয়ে সাধনভজন করতে লাগলেন। কিন্তু প্রকৃত সাধু হওয়া আর তাঁর হল না। এই হচ্ছে সংসার—বিশালাক্ষীর দ।''

''আবার রোমে ক্যাটাকুম্বস (catacombs) দেখতে গিয়েছিলাম। ক্যাটাকুম্বস হল মাটির তলায় সুড়ঙ্গের মধ্যে সারি সারি কবরখানা। ওখানে ঢুকলে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। সে এক গোলকধাঁধা!

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখিকা

মনে হয়, সঙ্গে যে-স্থানীয় গাইড রয়েছে, সে যদি কোনক্রমে পথ ভুলে যায়, তাহলে কী গতি হবে? এই সংসার! এই জগতটা হচ্ছে মায়া। যেন ঈশ্বর ঘোমটা দিয়ে আছেন। ঘোমটাটা মায়া। ঘোমটাকেই আমরা ঈশ্বর মনে করছি। কখনও মনে করছি টাকাই ঈশ্বর। কখনও আবার ভাবছি রাজনৈতিক ক্ষমতা, মান-যশই ঈশ্বর। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে ঈশ্বর রয়েছেন।"

'বিবেকচূড়ামণি'র ক্লাসে মহামায়ার মায়া বোঝাতে, সংসারের অনিত্যতা বোঝাতে গিয়ে মহারাজ বলছেন, ''দুজন অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছেন। একজন সম্ভবত ডাক্তার। তা একদিন বিছানা বাঁধার প্লাস্টিকের দড়ি খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে একজন আর একজনকে বললেন, 'কী ব্যাপার? আমার দড়িটা পাচ্ছি না যে! নিশ্চয় তুই নিয়েছিস?' দ্বিতীয়জনও রেগে উঠে বললেন, 'আমি! আমি নিতে যাব কেন? এটা তো আমার দড়ি!' ব্যাস, লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। অন্যরা বহু চেষ্টা করেও থামাতে পারেন না। শেষে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে গেল। একটা সামান্য দড়ির জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ! ভাবা যায়? এই মায়া!

''আমাদের মঠেরই এক সাধুর ঘটনা। তার বাবা দুঁদে জমিদার, উচ্চশিক্ষিত। সাত মেয়ে আর ওই একটি ছেলে। ছেলে সন্ন্যাসী হবে এই ভয়ে সর্বদা তাকে চোখে চোখে রাখেন। একবার এক আশ্রমে গিয়েছেন, ছেলেও সঙ্গে আছে। তা রাতেও উঠে উঠে দেখছেন ছেলে শুয়ে আছে না পালাল। এই হচ্ছে বন্ধন!

''আমরা তখন ব্রহ্মচারী। একটি ছাত্রের টাইফয়েড হয়েছে। খুব সেবা করে তাকে সারানো হল। ডাক্তার বললেন, 'রোজ ওকে একটু তালমিছরি খাওয়াবেন।' ঘরে একটি লম্বা শিশিতে তালমিছরি থাকত। আমরা যেই শিশিতে হাত দিতাম, অমনি ওর মুখ হাঁ হয়ে যেত; আর ও সারাদিন সেই শিশিটার দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকত। বিবেকচূড়ামণি বলছেন, পশুকে যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, মন-বাসনাও তেমনি আমাদের বেঁধে রাখে। আমরা একটু সুখে ধেই ধেই করে নাচি আর একটু দুঃখে কপাল চাপড়াই—এটাই আমাদের অবিদ্যা বা 'অজ্ঞান'। বিষয়-অরণ্যে মন মহাব্যাঘ্রের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

জ্ঞান কীভাবে হবে—এই প্রসঙ্গে একদিন মহারাজ বললেন, ''শুধু বিচার করতে হবে। আত্মা-অনাত্মা, নিত্য-অনিত্য; এখানে ঈশ্বরের স্থান নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'মন তোর'। আসল কথা হল, সব ভিতরে। তাই ধ্যান-ট্যান করতে বলা। এসবের উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে নিজের ভিতরে খোঁজো। বর্তমান আমি যেন ভবিষ্যৎ আমিকে পুজো করছি, প্রকৃত স্বরূপকে পুজো করছি। পুজো মানে তো তাই। দেখুন এটা কতটা বিজ্ঞানসম্মত। আমি আমার কাছেই প্রার্থনা করছি—দয়া করে আমার দুর্বলতা, আমার অজ্ঞানতা দূর করে দাও। হনুমান কী সুন্দরভাবে বলছেন, 'দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽহং জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ, আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহম্।'—হে রাম, নিজেকে যখন দেহ মনে করি তখন আমি তোমার দাস; যখন নিজেকে জীব ভাবি, তখন আমি তোমার অংশ। আবার যখন নিজেকে আত্মা মনে করি, তখন তুমি আমি একাকার।"

মহারাজ দুরূহ তত্ত্ব এমন সহজ ভঙ্গিতে বোঝাতেন যেন গল্প করছেন। এইভাবে ধর্মের সার অংশটি, মূল জিনিসটি মনের মধ্যে গেঁথে দিতেন। বিবেকচূড়ামণিতে পঞ্চকোশের কথা আছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ। বিজ্ঞানময় কোশ প্রসঙ্গে মহারাজ বলতেন, ''বিজ্ঞান মানে বুদ্ধি। মন সংকল্প- বিকল্পাত্মক কিন্তু বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি কিন্তু আত্মা নয় তবে বুদ্ধি আত্মার সবচেয়ে কাছে। অহং হল বুদ্ধি। বুদ্ধি মলিন

তাই সেই অপরিষ্কার কাচে আত্মার প্রতিফলন হয় না। বুদ্ধি যত স্বচ্ছ হবে ততই আমরা আত্মোপলব্ধির পথে এগিয়ে যাব।

''অনাদিকাল থেকে আমি এক অজ্ঞানস্রোতে ভেসে চলেছি। হাতে পতাকা। কীসের? 'অহং' -এর। অহং যেন রাজা। সারা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করব, হুকুম করব আমি। রাজার তো আবার মন্ত্রী, সৈন্য-সামন্ত চাই। তারা হল ইন্দ্রিয়। আর রাজ্য হল সংসার। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা প্রজা। আবার বিপক্ষ দলও আছে। আমার এটা চাই, ওটা চাই। বড় বাড়ির বাসনা। যেই তা মিটল অমনি বাসনা আরও বেড়ে গেল। আরও টাকা চাই। হল। নামযশ চাই এবার। মৃত্যু এসে গেল, ওটা পূরণ হল না। মৃত্যুর পর অস্থিরতা, কখন দেহধারণ করব। দেহধারণ করামাত্র অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করতে মেতে উঠব।

''আমার যদি মন খারাপ হয়, জগতেরও মন খারাপ হতে হবে। পিঁপড়ের জিনিস নিতে যান, কামড়ে দেবে। 'এটা আমার।' আবার আমার জিনিস নিতে যান, আমিও কামড়ে দেব। এই অহং-এর জন্যই তো দেহধারণ। রক্ত খাবার বাসনা—জোঁক হল। মাংস খাবার বাসনা—বাঘ হল। আবার মনুষ্য শরীরেও জোঁকের মতো, বাঘের মতো আচরণ থাকে। তাই মৃত্যুর পর ঊর্ধ্বগতি, অধোগতি দুই-ই হয়। ভোগ করব, ভাল স্বাস্থ্য চাই। সংসারে রাজা আমি। কতজনকে সম্পূর্ণ অকারণে হয়তো কত কটু কথা বললাম। আবার ভাবি সংসারে আমি যদি না থাকি, আমি যদি আজ মরে যাই তো জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সব আমি সামলাচ্ছি কিনা! এক পাগল মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে একটার পর একটা বাড়িতে গিয়ে পেছনদিকে যে ভাঙা হাঁড়ি-কলসি আছে তা ভেঙে ভেঙে বেড়াচ্ছে আর বলছে, আর পারি না। কিন্তু বুদ্ধি স্বচ্ছ, শুদ্ধ হলে এই দেহেই আবার স্বরূপজ্ঞান হয়। তখন দেখে আমিই তো সব হয়েছি, আর কী চাইব? কোনও বাসনা নেই। তাই বিবেক-বৈরাগ্য এই দুইয়ের সাহায্য নিয়ে অজ্ঞানতা দূর করতে হবে। বিবেকও মন। কিন্তু ওই কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে।''

সংসারে ঠাকুরকে ধরে চললে তার ফল কী হয় সেকথা বোঝাতে গিয়ে মহারাজ প্রায়ই বলতেন, ''ঠাকুর বলতেন, সংসারে আছ, থাকো, কিন্তু খুঁটি ধরে থাকো। বাস্তবিক সংসারে তো দুঃখ-বিপদ-শোকতাপে অধৈর্য করে দেয়। কিন্তু খুঁটি ধরে থাকলে পড়ে যাবার ভয় নেই।''

মহারাজ তাঁর স্বচক্ষে দেখা একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে এই প্রসঙ্গটি বোঝাতেন : ''আমি দুজন ডাক্তারকে জানতাম। দুজনেই বড় ডাক্তার, প্রথম জনের একটিই ছেলে। সেও ডাক্তারি পাশ করেছে। বাবা তার প্র্যাকটিসের জন্য চেম্বার করে দিয়েছেন। ছেলের বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে। তা, সেই ছেলে হঠাৎ মারা গেল। সবাই সান্ত্বনা দিতে এসে দেখেন তিনি ঠাকুরঘরে বসে আছেন। পরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'বুঝেছি আপনারা আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছেন, কিন্তু যাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন; এতে আর দুঃখ করার কী আছে। আমার কাছে যে কদিন রেখেছিলেন, সাধ্যমতো তার যত্ন করেছি।'

''দ্বিতীয় ডাক্তার যিনি, তাঁর দু-তিনটি ছেলে। তা তাঁরও একটি ছেলে মারা গেল। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি অধীর হয়ে আমাকে বলছেন, 'বলুন তো আমাকে আর কতদিন এই শাস্তি ভোগ করতে হবে? আর কতদিন বাঁচতে হবে? আর বাঁচার কোনও ইচ্ছা নেই। জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে।'

''দেখুন, প্রথমজন নিয়মিত পূজার্চনা করতেন, ভগবানকে ভালবাসতেন, তাই ভেতর থেকে শক্তি পেয়েছেন। দ্বিতীয়জন ঈশ্বরকে ধরেননি, তাই শোকে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।''

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে মহারাজ বলছেন, ''নিঃস্ব তিনি, কিন্তু কী আনন্দঘন পুরুষ! যেন সব পেয়েছেন। কী পেয়েছেন?

কীসের জন্য এত তৃপ্তির হাসি তাঁর মুখে? কোন্ ধনে ধনী তিনি? সে-ধন অন্তরের, বাইরের নয়। তা অপার্থিব, অতীন্দ্রিয় ঐশ্বর্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই তাঁর বাণী। সে-বাণী ভারতের প্রতি সতর্কবাণী। পাছে ভারত পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে, তার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী।

''খারাপকে সবাই খারাপ বলতে পারে, কিন্তু কজন পারে ভাল করতে? শ্রীরামকৃষ্ণ পারতেন। তাঁর কাছে পাপীও নারায়ণ। তাই তিনি প্রেমপাথার, তাই তিনি যুগাবতার।''

ঠাকুরকে খুব আপনার করে দিতেন মহারাজ। বলতেন, ''ঠাকুরের সঙ্গে আটপৌরে সম্পর্ক পাতাতে হয়। তাঁকে দূরের করে রাখতে নেই। একেবারে বন্দি করে ফেলো। ঠাকুরকে ভালবেসে একেবারে বন্দি করে ফেলো। তাঁকে জাপটে ধরো; তাঁর মধ্যে ডুবে যাও, তলিয়ে যাও একেবারে। কোনওদিকে মন দিয়ো না। অন্য কোনও কিছুই চেয়ো না, শুধু ঠাকুরকে মনপ্রাণ সঁপে দাও।''

ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট থেকে শোভাযাত্রার প্রবর্তন করেছিলেন লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। নিজে যেতেন। বিপুল সমারোহে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোত গোলপার্ক থেকে। বিভিন্ন স্কুল, প্রতিষ্ঠান, এমনকী বস্তি থেকেও বহু মানুষ শোভাযাত্রা করে আসতেন। শোভাযাত্রা মিলিত হত বিবেকানন্দ পার্কে। মহারাজ তাঁর দিব্য উপস্থিতি দিয়ে, অমৃতনিষ্যন্দী হাসি দিয়ে সকলকে শোভাযাত্রার প্রাণকেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বেঁধে দিতেন। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে বলতেন তিনি। তাঁর সেই ভাবোদ্দীপক বাণী শোনবার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ অপেক্ষা করে থাকতেন। ১৯৯৭ সালের ১৬ মার্চের শোভাযাত্রার শেষে মহারাজ যা বলেছিলেন, আজও তা আমার প্রাণে গাঁথা হয়ে আছে : ''এই যে আজ আপনারা এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেছেন, কত কষ্ট করে রোদের মধ্যে বসে আছেন, এর যে কী বিপুল সম্ভাবনা, কী গভীর তাৎপর্য, তা হয়তো এখন বুঝতে পারছেন না। আমরা কেউই হয়তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখব, আমরা সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়েছি। অবাক হয়ে ভাবছি 'এই আমি কি সেই আমি?'

''শ্রীরামকৃষ্ণ অপূর্ব এক শিল্পী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভাল মূর্তি গড়তেন। কুমোরেরা মূর্তি গড়লে চোখ আঁকার জন্য তাঁর ডাক পড়ত। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, ছোটবেলায় তিনি যেমন করে দেবমূর্তি গড়তেন, তেমন করে আমাদেরও গড়ে তুলুন। আমাদের 'মান হুঁশ' করে তুলুন, দেবতা করে তুলুন।''

ধর্মজগৎ ভাবের জগৎ। ভগবান ভাবের বিষয়। আর লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন সেই ভগবদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ। আশির দশক থেকে আমরা যখন তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি, তখন লক্ষ করেছি ঈশ্বরীয় ভাবে টইটম্বুর হয়ে থাকতেন তিনি। তাঁর চলায়-বলায়, হাসিতে, দৃষ্টিতে দিব্যভাব উথলে উঠত। একটি শ্লোক আছে,

''নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥''

—যাঁদের হৃদয়ে মঙ্গলস্বরূপ ভগবান সর্বদা বিরাজ করেন, তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে নিত্য উৎসব, নিত্যশ্রী এবং নিত্য মঙ্গল। সেখানে সব আনন্দময়, সুন্দর, মঙ্গলময়। যিনি আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করেন, তিনিও আনন্দের নির্ঝর হয়ে যান, সকলকে আনন্দস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যান। লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন এই শ্লোকটির মূর্ত বিগ্রহ। মহারাজ যখন গোলপার্কে থাকতেন, মনে হত তিনি যেন সারা ইনস্টিটিউট জুড়ে আছেন। আক্ষরিক অর্থেই সেখানে নিত্য উৎসব লেগে থাকত, নিত্য আনন্দের হাট বসত। আর সে আনন্দের প্রাণকেন্দ্র ঈশ্বর বা শ্রীরামকৃষ্ণ। *ক্রমশ*